স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ

বাংলাদেশ: অর্থনীতির ৫০ বছর

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

আদর্শ

উৎসর্গ

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা।

দুঃসহ এ বেদনার কণ্টক পথ বেয়ে
শোষণের নাগপাশ ছিঁড়লে যারা।

যুগের নিষ্ঠুর বন্ধন হতে
মুক্তির এ বারতা আনলে যারা।

সূচি

শুরুর কথা ১১

মুখবন্ধ ১৭

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও বিশ্ব অর্থনীতি ২৯

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ধারা ৩৭

- অধিগ্রহণ ও পরিবর্তন ৩৮
- বাজার অর্থনীতিতে আগমন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ৪৮
- ওয়াশিংটন কনসেনসাস গ্রহণ, উন্নয়ন-অনুন্নয়নের কাল ৫৭
- পোস্ট ওয়াশিংটন কনসেনসাসভিত্তিক সংস্কার ও বিকাশ ৬৯

অর্থনীতির চলমান দশক ৭৬

- উচ্চ প্রবৃদ্ধি ৭৯
- মধ্যম আয়ের দেশ ৭৯
- রানা প্লাজার আগে ও পরে ৮০
- সবুজ কারখানা ৮১
- এগিয়ে থাকা সাতটি খাত ৮১
- মোবাইল ব্যাংকিংয়ের বিকাশ ৮২
- দেশের টাকায় পদ্মা সেতু ৮৫
- ঠিকাদারদের দশক ৯৪
- রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন ব্যাংক ৯৬
- খেলাপিবান্ধব দশক ৯৭

আর্থিক কেলেঙ্কারির দশক ৯৭
বেসিক ব্যাংকের পতন ও চাঞ্চল্যকর আর্থিক কেলেঙ্কারি ৯৯
রিজার্ভ চুরি ১০৩
নিম্ন কর-জিডিপির হার ১০৫

একনজরে ৫০ বছরের জিডিপি বৃদ্ধির সারাংশ ১১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনীতির বিন্যাস ১২৩
উৎপাদন খাত ১২৬
খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা ১২৬
রেমিট্যান্স ১২৭
পরিবহন খাত ১২৮
কৃষি ও বনায়ন ১২৯
নির্মাণ খাত ১২৯
অন্যান্য ১২৯
অনানুষ্ঠানিক ১৩০
রপ্তানি বহুমুখীকরণ ১৩৪

অর্থনীতির সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্তসম্পর্ক ১৩৭
বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের সচিত্র অবস্থান ১৩৭
মানব উন্নয়ন সূচক ২০২০ ১৪০
বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক ১৪১
মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ১৪৪
পরিবেশ ১৪৫
বাসযোগ্য নগরের তালিকায় রাজধানীর অবস্থান ১৪৮
আইনের শাসন ১৫০
নাগরিক নিরাপত্তা ১৫২
শ্রম মজুরির মান ১৫৪
সামাজিক উত্তরণ সূচক ১৫৬
শিক্ষা ও বেকারত্ব ১৫৭
সামাজিক সুরক্ষার কার্যক্রম ১৬১
ধনবৈষম্য ১৬২

দারিদ্র্য বনাম জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১৬৪
ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন সূচকে বৈষম্য ১৬৬
বেকারত্বের বিপরীতে ধনিক শ্রেণির উত্থান ১৬৭

তৃতীয় অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন ১৭৩
স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ১৭৬
নগর দারিদ্র্য: ক্ষুধার্তের হাহাকার অভাবিত ১৭৭
দরিদ্র অবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিহীন ব্যাংকিং খাত ১৭৯
মহামারির অভিঘাতে দারিদ্র্য কতটা বেড়েছে? ১৮১
পিপিপি-২০১১ ৩.২-ডলার সংজ্ঞামতে নতুন দারিদ্র্য ভিত্তিমান ১৮২
টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে নয়া কৌশল কী হতে পারে? ১৮৩

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থনীতির সাম্প্রতিক ধারা ১৮৯
খেলাপি ঋণ ১৮৯
কালোটাকার সাদাকরণ ১৯৮
অভ্যন্তরীণ ঋণের ফাঁদ ১৯৯
বৈদেশিক ঋণের ট্রেন্ড ব্রেক ২০০
বেসরকারি ঋণপ্রবাহ ২০২
ঋণের সুদ প্রদান, বাজেটের অন্যতম শীর্ষ খাত! ২০৪
মাথাপিছু ঋণের বোঝা ২০৫
ঘাটতি বাজেটের গন্তব্য কোথায়? ২০৫
ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ থেকে ঋণ ২০৯
বাণিজ্য উন্মুক্তকরণ (বাণিজ্য-জিডিপি) ২১৩
ব্যবসা সহজীকরণ সূচক ২১৪
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভোগ ২১৭
প্রাইভেট ও পাবলিক কনজাম্পশন ২২১
আমদানি ও রপ্তানি আয় ২২২
ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি ২২৫
পণ্যভিত্তিক আমদানি ২২৬

শস্য উৎপাদন ও খাদ্যপণ্য আমদানি ২২৭
নির্মাণশিল্পের উপকরণ ২২৮
মধ্যবিত্তের বিকাশ ২২৯
মূল্যস্ফীতি ২৩২
করোনার প্রণোদনা প্যাকেজ ২৩৩

সুবর্ণজয়ন্তীতে অর্থনীতির অবস্থান কোথায়? ২৩৯
রস্টো থিওরি (আধুনিকায়ন তত্ত্ব) ২৪০
ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটেবিলিটি হাইপোথেসিস ২৮২

উপসংহার ২৯১

পরিশিষ্ট ৩০১
ওয়াশিংটন সমঝোতা ও বেইজিং সমঝোতার তুলনা ৩০১
দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলপত্র ৩০২
ওয়াশিংটন সমঝোতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মডেলের তুলনা ৩০২
মানব উন্নয়ন সূচক ৩০৩

শুরুর কথা

গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার শপথকে বুকে আঁকড়ে ধরে ১৯৭১ সালে অর্থনৈতিক শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে চিরস্থায়ী মুক্তির এক আলোকযাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২১ সালে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতিও সুবর্ণজয়ন্তীতে পদার্পণ করতে যাচ্ছে।

গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ৫০ বছর বয়সী বাংলাদেশের অবস্থান আজ ঠিক কোথায়, এই মূল্যায়ন তৈরি একান্তই দরকার। বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে আমাদের অতীতের ৫০ বছরের অর্জন ও ব্যর্থতার সুনিপুণ পর্যালোচনা করা সময়ের দাবি। আমাদের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির হিসাবনিকাশ, সরকারগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার-বিশ্লেষণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানান সব অর্জনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে নতুন পথপরিক্রমার সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করাই সুবর্ণজয়ন্তীর প্রধানতম উপলব্ধি হওয়া চাই।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্নকে ধারণ করে গত এক দশক পথ চলেছে বাংলাদেশ, সেই সঙ্গে একটি মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে নিজেকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করার অঙ্গীকার করেছে। একসময়ের দরিদ্র ও প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের এমন মর্যাদা নিশ্চয়ই একটা মহিমান্বিত বিষয়।

পাশাপাশি আগামী দিনের হীরকজয়ন্তী (৬০), প্লাটিনামজয়ন্তী (৭৫) কিংবা শতবর্ষ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ অর্থনীতি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যগুলো ঠিক কী কী, তার আলোচনা এখনই শুরু হয়ে যাওয়া ভালো। অর্থনীতি, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা ও বাক্‌স্বাধীনতায় আগামীর দিনে আমাদের গন্তব্য কোথায় হবে, তা নিয়ে সমাজের সব স্তরের বোঝাপড়া জরুরি বিষয়। তার জন্য চাই, দেশের নাগরিক সমাজ, প্রতিষ্ঠান, বুদ্ধিজীবী, রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের মধ্যে অতীত অর্থনীতির সাফল্য ও ব্যর্থতার ধারাগুলো উপলব্ধি করা, যার মাধ্যমে নতুন বোঝাপড়াগুলো তৈরি হবে। এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই তৈরি হবে রাষ্ট্রীয় অর্জনের নতুন নতুন অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপকল্প, লক্ষ্য ও অভিলক্ষ্য।

'বাংলাদেশ: অর্থনীতির ৫০ বছর' স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। এখানে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিদ্যায়তনিক (একাডেমিক) ও তাত্ত্বিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়নি; বরং এটা বাংলাদেশের গত ৫০ বছরের চলমান অর্থনীতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আলোচনার একটা সহজ ধারাবিবরণী। সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করতে শ্রেণিকক্ষে পঠিত জটিল অর্থনৈতিক বিষয়কে আলোচনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেসব প্রায়োগিক আর্থসামাজিক সূচক দিয়ে অর্থনীতির অবস্থা বা দেশের আর্থিক খাতের স্বাস্থ্যকে বোঝার চেষ্টা করা হয়, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচকের আলোচনা আনা হয়েছে। একেবারে শেষে গিয়ে সামান্য কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

পুস্তকের আলোচনাকে চারটি অধ্যায়ে বিভিক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিরই একটা বড় চরিত্রগত বাঁক তৈরির সময়ে, একটা বৈশ্বিক ক্রান্তিকালে। শীতল যুদ্ধকালীন বিশ্ব অর্থনীতির আচরণগত যে বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করেছে, তার একটা ছোট বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। এরপর বাংলাদেশের ৫০ বছরের শাসনকালকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। পুস্তকের কলেবর ছোট রাখতে কোনো অধ্যায়েই ভূমিকা ও সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের বিশদ আলোচনায় যাওয়া হয়নি। অর্থনৈতিক ধারার বিচারে সমজাতীয় শাসনকাল বা সরকারগুলোকে একই ভাগে

রাখা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন ও ব্যর্থতা আলোচনার পাশাপাশি এই সময়ের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কীভাবে বর্তমানকেও প্রভাবিত করছে, তার সীমিত কিছু বর্ণনা দেওয়া আছে। এই অধ্যায়ের শেষে বাংলাদেশের ৫০ বছরের দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির একটা সারসংক্ষেপ দেখানো আছে, এখানে বিশ্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বাংলদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক একটা চিত্র দেখনো হয়েছে খুব সংক্ষেপে। উন্নয়ন অর্থনীতির ধারাবিবরণী উপস্থাপনে পুস্তকে জিডিপিকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে ঠিক, তবে জিডিপির সঙ্গে অপরাপর কিছু সূচকের সামঞ্জস্যহীনতাকেও প্রশ্ন করা হয়েছে।

অধ্যায় দুইয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাত অতিসংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে (পারফরম্যান্স) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আর্থসামাজিক সূচকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনীতিকে লেখকের ব্যক্তিগত বিবেচনায় না দেখে একটা বহুপক্ষীয় বিবেচনায় দেখার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার তথ্য-উপাত্ত ও অর্থনৈতিক প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে সেগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে দারিদ্র্য বিমোচন একটি প্রধানতম টাস্কফোর্স বলে এ বিষয়কে অতিসীমিত পরিসরে আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক মনে করেছি। দারিদ্র্য বিমোচন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কার্যক্রম। বাংলাদেশের বেসরকারি দারিদ্র্য বিমোচন মডেল বিশ্বে প্রশংসিত। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের চলমান সরকারি ও বেসরকারি কৌশলের নতুন চ্যালেঞ্জগুলোকে এই অধ্যায়ে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে আলোচনায় আনা হয়েছে। অধ্যায় তিনে দারিদ্র্য বিমোচনে নতুন কৌশলের দরকার কেন, তার উপলব্ধি তৈরির সামান্য একটা চেষ্টা করা হয়েছে।

অধ্যায় চার আলোচ্য পুস্তকের বিশদ পরিসরজুড়ে আছে। এখানে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতি যে ২০১৩-১৪ সালের আগের অর্থনীতির

চেয়ে বৈশিষ্ট্যগতভাবে কিছুটা ভিন্ন, তা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে রাজস্ব আয়, আমদানি-রপ্তানি, বিদ্যুৎ ও ভোক্তা বাজার, প্রবাসী আয়, খেলাপি ঋণ, সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের ট্রেন্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিশ্বব্যাংকের তথ্য ও উপাত্তসহকারে পর্যবেক্ষণগুলো তুলে ধরা হয়েছে অধ্যায়ের শুরুর দিকে। পরের অংশে মূলত তিনটি মৌলিক প্রশ্ন এবং একটি সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরকে সামনে রেখে আলোচনা এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তি তৈরি করতে সীমিত পরিসরে প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক আলোচনাকে আনা হয়েছে।

ক. সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে অর্থনীতির সম্ভাব্য অবস্থান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করতে আমরা আধুনিকায়নের তত্ত্ব বা রস্টো থিউরি নিয়ে আলোচনা করে পরে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। আলোচনা যাতে একদিকদর্শী (বায়াসড) হয়ে না যায়, সে জন্য আমরা উন্নয়ন আধুনিকায়ন তত্ত্বের সমালোচনাকে সংক্ষেপে আলোচনায় এনেছি। প্রসঙ্গক্রমে ঠিক এখানেই আমরা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির দর্শনের ক্ষতগুলো নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোকপাত করেছি।

খ. গণতন্ত্রতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অবনমনকালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভঙ্গুরতার লক্ষণ আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা অধ্যাপক ডগলাস নর্থের লিমিটেড অ্যাকসেস থিউরির আলোচনা এনেছি।

গ. অর্থনীতিতে মন্দার কোনো আশঙ্কা আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা প্রফেসর হাইম্যান মিনিস্কির মডেল আলোচনা করে উত্তরের পথ খুঁজেছি!

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করা কঠিন কেন? অর্থাৎ কেইনসীয় প্রগতিশীল উদারনীতিবাদ কিংবা নয়া উদারনীতিবাদ উভয়ের কোনোটারই ন্যূনতম তাত্ত্বিক 'উপযোগ' প্রাপ্তির দিক থেকে সহজে আমাদের অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করা কঠিন কেন? এই সম্পূরক বিষয়টিও আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির অতীতের মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে মানুষের মাঝে রাষ্ট্রভাবনার নতুন চিন্তার বিকাশ ও প্রকাশ ঘটে,

মানুষের মধ্যে বৈষম্যবিরোধী সাম্যচিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে। নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়েই উদ্‌যাপিত হয় এক-একটি জয়ন্তী উৎসব। ঠিক এমন একটি মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই 'বাংলাদেশ: অর্থনীতির ৫০ বছর' পুস্তক প্রকাশের আয়োজন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে একাত্তরের রণাঙ্গনের বীর সেনানীসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের সব পর্যায়ের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি অকৃত্তিম শ্রদ্ধা ও সালাম নিবেদন করি। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ পাকের সমীপে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

'বাংলাদেশ: অর্থনীতির ৫০ বছর' বইয়ের ভাষ্য বিশেষজ্ঞ ভাবনা হিসেবে উপস্থাপন না করে; বরং নাগরিক সাংবাদিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনীতির একজন শিক্ষানবিশ ও উন্নয়ন অর্থনীতির লেখক হিসেবে টেকসই উন্নয়নের দৃষ্টিকোণকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির রচনা ও সংকলনে দেশের প্রতিথযশা শিক্ষক ও অর্থনীতিবিদদের গবেষণাকাজ, বক্তব্য, বিবৃতি ও প্রবন্ধের ব্যাপক সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সম্মানিত অধ্যাপক এম এম আকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শহীদুল জাহীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অর্থনীতির অধ্যাপক ড. রিজওয়ানুল ইসলাম, সাবেক সচিব অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, প্রথম আলোর বিশেষ বার্তা সম্পাদক শওকত হোসেন— এমন গুণীজনদের কাছে লেখক হিসেবে আমি বিশেষ ঋণী। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি করোনাকালে নিবেদিতপ্রাণ অর্থনীতিবিদ ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীরকে, যার বিভিন্ন গবেষণাকাজ আমাকে লেখক হিসেবে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। ড. তিতুমীর 'বাংলাদেশ: অর্থনীতির ৫০ বছর' বইয়ের ভূমিকা লিখে আমাকে ধন্য ও কৃতজ্ঞতাবোধে বাধিত করেছেন। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক গবেষক ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া, নেদারল্যান্ডসের ম্যাসট্রিকট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও গবেষক ড. এ্যান্ড্রু এ রয়, নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেসের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফ্যাকাল্টি ড. গোলাম রব্বানী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক ড. মারুফ মল্লিক এবং উন্নয়ন

অর্থনীতির ভাষ্যকার জিয়া হাসানকে, যারা পুস্তকের বিষয়বস্তুর নির্মাণ ও বিন্যাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। শ্রমসাধ্য এ কাজে সার্বক্ষণিক সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার অ্যাকাউন্টিং ও ফিন্যান্স স্নাতক স্ত্রী নাঈমা ফেরদৌসকেও।

বইটি গতানুগতিক নয়। এখানে অনেক তথ্য ও উপাত্তের সহজ উপস্থাপনের চেষ্টা আছে। বেশ কিছু চার্ট ও সারণি স্থান পেয়েছে বলে আদর্শ প্রকাশনীর সম্পাদকমণ্ডলীর জন্য পুস্তকের ছাপাখানা বিন্যাসের কাজ বেশ কঠিন ছিল। তাই বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই দেশের অন্যতম প্রধান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আদর্শের প্রকাশক এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সবাইকে।

এই পুস্তকের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজ রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর আত্মসমালোচনার কোনো নতুন স্থান তৈরি হলে, ভবিষ্যৎ অর্থনীতির গন্তব্য নিয়ে কৌশলগত কিংবা দার্শনিক কোনো আলোচনার সূত্রপাত হলে লেখক হিসেবে নিজেকে একান্তই ধন্য মনে করব। 'বাংলাদেশ: অর্থনীতির ৫০ বছর' বইয়ের মাধ্যমে আমাদের ছাত্র, পেশাজীবী, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ সামান্যতম উপকৃত হলে, উন্নয়ন দর্শনের ক্ষত সারানোর উপলব্ধি তৈরি হলে, টেকসই উন্নয়নের বোধে তাড়িত হলে, ব্যক্তি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা অতীব সার্থকতা পাবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

ক্ষণিকালয়
মাসট্রিকট, দ্য নেদারল্যান্ডস
১৬ ডিসেম্বর ২০২০

মুখবন্ধ

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে ভবিষ্যৎমুখী পরিপ্রেক্ষিত-চিন্তার জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতির সমীক্ষণ জরুরি। এ ধরনের পর্যবেক্ষণে সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো খুঁজে পাওয়া যায় এবং সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব। ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব 'বাংলাদেশ: অর্থনীতির ৫০ বছর' বইটিতে অর্ধশতাব্দীকাল সময়ে কোথায় পৌঁছানো যেত এবং প্রকৃতপক্ষে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

এ ধরনের পর্যালোচনায় বিশ্লেষণের মৌল-চলক নির্ধারণ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক আছে। আবার অর্থনীতির সূচক এবং বিভিন্ন খাত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বাধা হয়ে দাঁড়ায়— সবার বোধগম্য, প্রাঞ্জল ও সাবলীল করে উপস্থাপন। জন্মলগ্ন থেকেই অর্থশাস্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তত্ত্বের ভারে ন্যুব্জ। আবার তাত্ত্বিক বিষয়ের ওপর নির্ভর না করে আলোচনাও সম্ভব নয়। মোদ্দাকথা, তত্ত্ব ও পরিভাষাগুলোকে সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপনা বেশ চ্যালেঞ্জ।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্ধশতাব্দীকালের গতিপথকে কীভাবে পাঠ করা যায় এবং কী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা যায়, সে প্রশ্ন খোঁজা দরকার। এই গতিপথ একটি ঐতিহাসিক পরিক্রমা, তাই একে ইতিহাসের আলোকেই দেখতে হবে। বাংলাদেশের ইতিহাসের নিরিখে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চলকগুলোর সম্পর্ক বুঝতে গেলে চলকগুলোর একটি নিজস্ব আন্তসম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। দেখার দৃষ্টিভঙ্গিগুলো নিয়েও বিতর্ক আছে। কোনোটাকে বলা হয়েছে পুরোপুরি পশ্চিমা কায়দার, কোনোটা পশ্চিমা প্রভাবিত, কোনোটা বা উপমহাদেশীয় কায়দা। বিভিন্ন

দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রক্রিয়াগত পার্থক্যও বিদ্যমান। কেউ আরোহী পদ্ধতি অবলম্বনের কথা বলেছেন। কেউ জোর দিয়েছেন অবরোহী পদ্ধতির ওপর। কেউ কেউ আবার উপলব্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে গঠনবাদীর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

বস্তুত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কায়দায় উপলব্ধি করার দরকার রয়েছে। ইতিহাসের অনেক কিছুই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়েছে। আর নিজস্বতা ছাড়া ধার করা কাঠামোয় ঐতিহাসিক গতিপথ বোঝা সম্ভব নয়। তবে নিজস্ব সহজাত প্রাসঙ্গিক পদ্ধতিতে হলেও দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটি যেন বৈশ্বিক ও সর্বজনীন হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত তিন মূলস্তম্ভ— সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার হলো জাতিরাষ্ট্র হিসেবে অর্জন ও ব্যর্থতাগুলো মূল্যায়নের মূল নিয়ামক। এই তিন মূল স্তম্ভের আলোকে অর্থনীতির সূচকগুলো বিশ্লেষণ করলে একটি চিত্র পাওয়া যাবে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা ঘটনা ও বিষয়ের ওপর আলোকপাতের প্রয়োজন রয়েছে। এগুলোর বিশ্লেষণ ছাড়া গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জন ও ব্যর্থতার বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ, প্রতিটি অর্থনৈতিক নীতি-কাঠামোর একটি ইতিহাসসংশ্লিষ্টতা আছে। আর এগুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি।

বাংলাদেশের গত পঞ্চাশ বছরের শাসনকালকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে প্রতিটি শাসনকালে গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি-কাঠামোসমূহের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। শাসনকালের পরিবর্তনে বিভিন্ন সময়ে এ নীতি-কাঠামোসমূহ আবার পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে। অর্থনৈতিক অর্জন ও ব্যর্থতাগুলো নিরূপণ ও বিশ্লেষণে তাই প্রতিটি শাসনকাল এবং ওই সময়ে গৃহীত নীতি-কাঠামোসমূহের পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। নীতি-কাঠামোগুলো বিশ্লেষণের আলোকে অর্থনীতিতে বর্তমানে বিদ্যমান ঝুঁকি ও ব্যর্থতার স্বরূপও সামনে আনা প্রয়োজন।

বিগত পঞ্চাশ বছরে অর্থনীতি নানা ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। ফলে উন্নয়নের টেকসই যোগ্যতা অর্জন এবং বিদ্যমান সম্ভাবনাগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগানো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি। অর্থনীতিতে

বিদ্যমান ঝুঁকিগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হলে পুঁজির চরিত্র নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। পুঁজির চরিত্র দ্বারা বোঝানো হচ্ছে– অর্থনীতিতে কীভাবে পুঁজি তৈরি হচ্ছে, কীভাবে পুঁজির বণ্টন হচ্ছে, কারা পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং পুঁজি সৃষ্টির প্রক্রিয়া কাদের কবজায়। পুঁজির চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বোঝা যাবে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের চেহারা। আর এভাবে ঝুঁকিগুলোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভব হবে।

পঞ্চাশ বছরের অর্থনীতি পাঠ করতে হলে পুঁজির পাশাপাশি অর্থনীতির অন্য তিন মূল চলক তথা– শ্রম, ভূমি ও প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত জরুরি। এ ক্ষেত্রে শ্রমের ধরন, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিকের মজুরি, শ্রমের গুণমান, দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি নিয়ে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। একই সঙ্গে ভূমির বৈশিষ্ট্য, গঠন, বণ্টন, ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনীতিতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, সম্ভাবনা, প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট বৈষম্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা জরুরি। এই আলোচনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক চলকগুলোর প্রকৃত অবস্থা বোঝা সম্ভব। পাশাপাশি এই বিশ্লেষণ করতে অর্থনীতির খাতভিত্তিক একটি সার্বিক চিত্র উপস্থাপন প্রয়োজন।

অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচকের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে অর্থনৈতিক অবস্থার একটি প্রকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলা যাবে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সূচক ব্যবহারের পাশাপাশি অর্থনীতির টেকসই যোগ্যতা, ঝুঁকি, শক্তি, সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদির ওপর দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য তুলে আনার প্রয়োজন রয়েছে; যাতে এই পর্যালোচনার মাধ্যমে পঞ্চাশ বছরে অর্থনৈতিক অর্জন ও সীমাবদ্ধতার একটি সর্বাঙ্গীণ ও তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়।

অন্যদিকে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশ্বব্যাপী চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির বাস্তবতায় দারিদ্র্য ও অসমতা কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখে দিয়েছে। করোনার কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষ আয়রোজগারহীন হয়ে পড়েছে। সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বেকার, হতদরিদ্র, অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক, নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের

হাওয়া বইতে শুরু করেছে। প্রাসঙ্গিক কারণেই দারিদ্র্য বিমোচন এবং অসমতা হ্রাস নতুন চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে। ফলে নতুন বাস্তবতার আলোকে বিদ্যমান দারিদ্র্য বিমোচনকৌশল নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিদ্যমান নীতি-কাঠামোয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পথ উন্মোচিত হবে।

করোনাক্রান্তির আগেই অর্থনীতিতে মোটাদাগে দুই ধরনের ঝুঁকি ছিল। প্রথমত, যেকোনো অভিঘাত নিরসনের সক্ষমতার ঘাটতি; দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানগুলোর ভঙ্গুরতা ও অকার্যকারিতা। প্রবৃদ্ধির তুলনামূলক উচ্চহার সত্ত্বেও (যদিও প্রকৃত হিসাব নিয়ে সংশয় আছে) অর্থনীতি অভিঘাত সহনশীলতা ও মোকাবিলার সক্ষমতায় পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণও প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতা। অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হয়নি। একদিকে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে, অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো তথা সামাজিক নিয়ম-রীতি, প্রথা, রেওয়াজ, মূল্যবোধ ইত্যাদি ভেঙে পড়ছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত পরিবর্তন না হওয়ায় অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর হচ্ছিল না। ফলে একসময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের হার কমতে শুরু করে। পর্যাপ্তসংখ্যক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ব্যাহত হয়। ব্যাংক ও আর্থিক খাতে চরম অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব অর্থনীতির উপর্যুক্ত দুটি ঝুঁকিকে আরও তীব্রতর করে সামনে নিয়ে এসেছে।

বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক খাতে পরিমাণগত অগ্রগতি আশ্চর্য বা ধাঁধা নয়। অন্যান্য দেশের মতোই শ্রম নিয়োজনের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শ্রমিকের ছদ্মবেকারত্ব ও কর্ম স্বল্পতার (আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট) সংখ্যা অনেক। কৃষি খাতের ছদ্মবেকার ও উননিয়োজিত শ্রমিক গত শতাব্দীর আশির দশক থেকেই গ্রাম থেকে শহরে ও বিদেশে শ্রমিক হিসেবে গেছেন। আয়ের প্রায় পুরোটাই গ্রামে পাঠিয়েছেন, দারিদ্র্য কমেছে এবং ভোগ ব্যয় বেড়েছে। ভোগ ব্যয় বাড়ায় মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির পরিসর বেড়েছে। আর জিডিপি হচ্ছে বিনিয়োগ, ভোগ ব্যয়, সরকারি ব্যয় এবং আমদানি-রপ্তানির সমষ্টি। এই চলকগুলোয় পরিবর্তন এলে জিডিপি কমে বা বাড়ে। ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ ব্যয়নির্ভর মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বেড়েছে। সরকারের কর রাজস্ব আদায়ের এক নম্বর খাত এখন মূল্য সংযোজন কর

(ভ্যাট)। এই কর মূলত মানুষের ভোগের ওপর ধার্যকৃত। পরোক্ষ করের এ রকম ব্যাপ্তির ফলে সরকারের আয়ও বেড়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পুঁজির বিকাশ সাধারণ জনগণের অর্থেই সম্প্রসারিত হলো। মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট সাধারণ জনগণই বেশি দিয়ে থাকে। সরকারের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারি বিনিয়োগ-সক্ষমতাও বেড়েছে। ফলে ক্রমান্বয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দের আকার বেড়েছে। আবার মানুষের ভোগ ব্যয় বাড়ায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও ব্যক্তিগত ব্যয় বেড়েছে। এ কারণে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় স্বাস্থ্য খাতে ব্যক্তিগত ব্যয় (আউট অব পকেট এক্সপেন্ডিচার) বাংলাদেশে সর্বোচ্চ। মানুষের ব্যক্তিগত ব্যয় বাড়ায় এ সময়ে সামাজিক সূচকগুলোর তুলনামূলক অগ্রগতির মূল কারণ। তবে অধিকাংশ মানুষের সঞ্চয় বেড়েছে যৎসামান্যই। আবার সর্বজনীন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় দ্রততার সঙ্গে দারিদ্র্য-পরিস্থিতি থেকে বের হতে পারছে না।

মূলত বাংলাদেশের এই পরিবর্তন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাদী বিকাশের দিকে লক্ষ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। তবে পশ্চিমা বিশ্ব এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো অর্ডার বা শৃঙ্খলা। অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসব দেশ পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। কেউই জবাবদিহির ঊর্ধ্বে ছিল না। দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগে শাস্তি এড়াতে পারেনি। যার ফলে পুঁজিপতিরা নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মধ্যে থেকে উৎপাদনশীল কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। পুঁজিকে বিনিয়োগে খাটিয়েছেন। বাংলাদেশ আইনের শাসন বা আইনের দ্বারা শাসন প্রতিষ্ঠা দুর্বল। এখানে প্রতিষ্ঠানই কাজ করছে না। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে একটি গোষ্ঠী আদিম কায়দায় জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে সম্পদশালী হয়ে উঠছে। অতীতেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে সম্পদ আহরণ ও কেন্দ্রীভবনের চেষ্টা ঘটেছে। তবে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একটা বড় ধরনের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সম্পদ আহরণের এ আদিম প্রক্রিয়া এখন রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট গোষ্ঠীতন্ত্রের মাধ্যমে গতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

রাষ্ট্রক্ষমতার (অপ)ব্যবহার করে বা রাষ্ট্রক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় একটি গোষ্ঠী অঢেল সম্পদের মালিক হচ্ছে; কিন্তু সেই সম্পদ উৎপাদনশীল কাজে

লাগানো হচ্ছে না। ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। আদিম কায়দায় সম্পদশালী বা ধনীর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়লেও উৎপাদনশীল খাতের সম্প্রসারণ হচ্ছে না। এভাবে কতিপয়ের হাতে সম্পদের পুঞ্জীভবন ও কেন্দ্রীকরণ আগেও ছিল; তবে আগে এত বেশি অর্থ পাচার ছিল না। এখন একদিকে অর্থ পাচার বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। সরকারের রাজস্ব আয়ও বাড়ানো যাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি ঝুঁকির সম্মুখীন।

গোষ্ঠীতান্ত্রিক এ ব্যবস্থা স্বজনতোষী পুঁজিবাদ বা ক্রনি ক্যাপিটালিজমের মতো নয়। স্বজনতোষী পুঁজিবাদে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী শ্রেণি সরকারের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে ঝুঁকি সরকারের ওপর চাপিয়ে সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। এ ধরনের পুঁজিবাদ প্রকাশ্যে নিজেদের বাজারভিত্তিক স্বাধীন ব্যবসা বা কারবার হিসেবে দেখালেও সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ী শ্রেণির গোপন বোঝাপড়া থাকে। আবার বাংলাদেশের গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিউপ্যাট্রিমনিয়ালিজমের মধ্যেও ফেলা যায় না। নিউপ্যাট্রিমনিয়ালিজম বা নব্য-উত্তরাধিকারতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় অর্থসম্পদ, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা নিজেদের পরিবার বা তোষণকারীদের মধ্যেই বণ্টন করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে স্বজনতোষী পুঁজিবাদ, নব্য-উত্তরাধিকারতন্ত্র এবং আদিম পন্থায় পুঁজি সঞ্চয়নের মাধ্যমে জায়মান গোষ্ঠীতন্ত্রের মধ্যে তেমন পার্থক্য দেখা না গেলও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

বাংলাদেশে গোষ্ঠীতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো আদিম কায়দায় পুঁজি সঞ্চয়ন ও কেন্দ্রীভবনে। এখানে ব্যবসা বা কারবারের ঝুঁকি সরকারের ওপর চাপিয়েই ক্ষান্ত হয় না; মূলত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের (অপ)ব্যবহার করে সরকারি সম্পদ, অর্থ, ক্ষমতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে দখল করে নেয়। আবার এই ব্যবস্থা শুধু পরিবার বা উত্তরাধিকার বা দলীয় লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ ব্যবস্থা উল্লম্ব (ভার্টিক্যাল) আকারে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। আর আনুভূমিকভাবে ক্ষমতাকাঠামোর সবাই তথা রাজনীতিবিদ, আমলা, সামরিক বাহিনী, পুলিশ ইত্যাদি নেটওয়ার্কের সদস্য। এই নেটওয়ার্ক চালু থাকে 'বিকৃত' প্রণোদনা বা পারভার্সিভ ইনসেনটিভের মাধ্যমে। মূলত ক্লায়েন্টেলিসটিক বা গোষ্ঠীতান্ত্রিক

নেটওয়ার্ক গড়েই উঠেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে অবৈধ পন্থায় পুঁজি সঞ্চয়ন এবং সম্পদ বৃদ্ধির জন্য। অর্থাৎ রাজনীতিকে ব্যবসায় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা যায়, পুঁজির সঞ্চয়ন ঘটানো যায়— এ উপলব্ধি থেকেই এ নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি। মূলত সরকারি ও বেসরকারি খাত কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুঁজির অবৈধ সঞ্চয়ন চলছে।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তথা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যকার ক্ষমতার বণ্টনের মধ্যেই গোষ্ঠীতন্ত্রের ভিত। কারণ, ক্ষমতার বণ্টনের ওপর নির্ভর করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল। আবার ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল বণ্টনের ভিত্তিতে উৎপত্তি হয় বিভিন্ন শ্রেণি। বিভিন্ন শ্রেণি আবার গোষ্ঠীতন্ত্রে লীন হওয়ার মাধ্যমে নানা উপায়ে ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলাফলকে প্রভাবিত করে। দেখা গেছে, বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক বন্দোবস্তে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও বারবার হোঁচট খেয়েছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা গোষ্ঠীতন্ত্রের হাতেই কুক্ষিগত হয়েছে। রাষ্ট্রকে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের কাজে লাগিয়েছে। শাসকশ্রেণি ক্ষমতার একচেটিয়াত্ব বজায় রাখতে গোষ্ঠীতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদ অবৈধভাবে ব্যবহার করতে দিয়েছে। বিনিময়ে তারা শাসকদলের কাছে অনুগত থেকেছে; বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় সম্পদ, সুযোগ-সুবিধায় নিজেদের থাবা আরও বাড়িয়েছে। জবরদখলের মাধ্যমে আদিম পন্থায় পুঁজি সঞ্চয়ন করে চলেছে।

এই ব্যবস্থা থেকে উত্তরণে তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ফলাফলের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য একটি সমতাভিত্তিক (ইগালিটারিয়ান) গণতান্ত্রিক নাগরিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য সক্রিয় নাগরিকতা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন রয়েছে। নাগরিক সক্রিয়তা জনসম্পদের ব্যবহারে রাষ্ট্রের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা করতে পারে। জবাবদিহির মাধ্যমেই জাতীয় অর্থব্যবস্থা জনগণের হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হলো, কোভিড-১৯-পরবর্তী সময়ে প্রজাতন্ত্রের চেহারা কেমন হবে? কোভিড-১৯-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় ব্যক্তিজীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও কাঠামোয় বড় রকমের

পরিবর্তন হবে। এই পরিবর্তনে আগামীর বাংলাদেশকে নতুন প্রজন্ম কেমন দেখতে চায়? প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধের অর্ধশতাব্দীকাল পরে হলেও অবশ্যই পরিবর্তনের গতিমুখের ভিত্তি হতে হবে মুক্তিযুদ্ধের তিনটি মূল স্তম্ভ— সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। দ্বিতীয়ত, এই তিন মূলনীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাষ্ট্রকে মুক্তিযুদ্ধের জন-আকাঙ্ক্ষার সমতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক (ইগালিটেরিয়ান ডেমোক্রেসি) রাষ্ট্রে রূপান্তর করতে হবে। এই রূপান্তরে প্রত্যেক মানুষ, প্রতিটি খাত মূল্যায়িত হতে হবে এবং সে জন্য নির্দিষ্ট রূপকল্প থাকতে হবে।

আর এ জন্য কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধারের প্রকৃতিও হতে হবে সমতাভিত্তিক ও সর্বজনীন। সরকার নীতি-কৌশলে সক্রিয় প্রতিরোধ (অ্যাকটিভ রেসট্রেইন্ট) ব্যবস্থা নিলে একধরনের পুনরুদ্ধার হবে আর নীতি-কৌশলে সক্রিয় নিষ্ক্রিয়তার (অ্যাকটিভ ইনেকশন) আশ্রয় নিলে আরেক ধরনের পুনরুদ্ধার হবে। অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সক্রিয় প্রতিরোধব্যবস্থার ন্যূনতম চারটি শর্ত। প্রথমত, জনগণকে সরকারিভাবে গণদ্রব্য বা পাবলিক গুডস প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, অর্থনীতিতে সম্পদ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সুফল ও সুযোগ-সুবিধার বণ্টনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া। তৃতীয়ত, সামষ্টিক আর্থিক খাতে সরকারের প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ। চতুর্থত, অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের জন্য নীতিমালা। এই শর্তগুলো পূরণ হলে সম্পদ এবং অর্থনৈতিক সুফল ও সুযোগ-সুবিধাগুলো গুটিকয়েক গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়ে সব নাগরিকের কাছে পৌঁছাবে। ফলে পুনরুদ্ধার গতিপথ বৈষম্যমূলক না হয়ে একটি অপেক্ষাকৃত কম বৈষম্যের সাম্যাবস্থার দিকে ধাবিত হবে। কিন্তু সরকারের পুনরুদ্ধার নীতি-কৌশলে এই চারটি শর্ত পূরণ না হলে অর্থনীতি চরম বৈষম্যমূলক পুনরুদ্ধারের পথে যাবে এবং পুনরুদ্ধার গতিপথ ক্রমশ ইংরেজি 'কে' ('K') অক্ষরের চেহারা ধারণ করবে। সম্পদ উচ্চবিত্ত কিছু গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হবে এবং বিপরীতক্রমে দারিদ্র্য পরিস্থিতি বাড়তে থাকবে।

'বাংলাদেশ: অর্থনীতির ৫০ বছর' বইটির লেখক প্রতিটি অধ্যায়ের বিশ্লেষণে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের সার্থক সমাবেশের মাধ্যমে যুক্তি ও প্রমাণ হাজির করেছেন। তথ্য-উপাত্তের সমাহার সত্ত্বেও প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনা সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্য ও সাবলীল